বংশাবলী।
শাক্যরাজ জয়সেন
সিংহহনু × কাঞ্চনা
শুদ্ধোদন × মায়া ও মহা প্রজাপতি
৪ ভাই*
প্রমিতা
অমৃতা × সুপ্রবুদ্ধ
সিদ্ধার্থ × যশোধরা
নন্দ
রূপানন্দ
রাহুল
কোলরাজ দেবদহ
অঞ্জন
কাঞ্চনা
দণ্ডপাণি
মায়া
মহা প্রজাপতি
দেবদত্ত
যশোধরা
*১। শুক্লোদন
দেবদত্ত
আনন্দ
২। অমৃতোদন
মহানাম
অনিরুদ্ধ
৩। দোতোদন
৪। ঘনিতোদন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয়।

বুদ্ধদেব ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, বৌদ্ধেরা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এদেশে বিদ্যমান ছিলেন ও কোন্ সময়েই বা এখান হইতে অন্তর্হিত হন, আমাদের সকলেরই সে বিষয়ে জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল নিরূপণের বেলায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তি ও অনুমান, শিলালিপি ও প্রোথিত ধাতুমুদ্রা ইত্যাদি সাধন ও উপকরণ হইতে যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহাতেই একপ্রকার সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তত্রাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদয়াস্ত, উন্নতি অবনতির কাল কতকগুলি বিশেষ কারণ বশতঃ নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেই সকল কাল-নির্ণায়ক নিদর্শন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, বুদ্ধ শাক্যসিংহের মৃত্যুকাল যতদূর জানা যায়, খুব সম্ভব খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয়; তাহার কালও একপ্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে মগধ রাজ্যাধিপতি অশোক রাজার মহাসভা সর্ব্বাপেক্ষা

প্রসিদ্ধ। এই অশোক রাজা গ্রীকদের সান্দ্রাকোতস্ (চন্দ্রগুপ্তের) পৌত্র; পাটলিপুত্র (পাটনা) ইঁহার রাজধানী। অশোক রাজার পূর্ব্বে দুইটি বৌদ্ধ সভা হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর অনতিকালাবলম্বে রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে প্রথম সভায় বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকারঃ—সূত্রপিটক (বুদ্ধের কথাবার্ত্তা), বিনয়পিটক (ব্যবহার ধর্ম্ম) এবং অভিধর্ম্মপিটক (দর্শনশাস্ত্র); এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ভারতবর্ষের ভূপতিগণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্রথমে মগধরাজ বিম্বিসার, পরে সম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার উৎসাহপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। তাঁহার অনুশাসন-লিপিসকল, প্রোথিত স্তম্ভ, গিরি ও গিরি-গুহায় খোদিত, কাবুল নদীর উত্তর হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত—পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমে গির্ণার (কাঠেওয়ার) পর্য্যন্ত—পূর্ব্বাপর তোয়নিধির মধ্যস্থ সমুদয় ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল লেখা আবিষ্কৃত এবং অর্থ সহিত অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুশাসনপত্রে অশোকরাজার স্বধর্ম্মানুরাগ, উদার নিঃস্বার্থতা, দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসাদি গুণের যে দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন তিনি ধর্ম্মাশোক নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার একটি খোদিত স্তম্ভ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলবস্তুর চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হয়, তাহা তিন চারি বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সেকন্দর সা'র ভারত আক্রমণের পর হইতে যে কয়েক জন গ্রীকদেশীয় লোক ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালবর্ত্তী ধর্ম্ম ও রীতিনীতি বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। ইহাঁদের মধ্যে গ্রীক্ দূত মেগাস্থিনীস একজন প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ রাজধানী পাটলিপুত্রে কিয়ৎকাল বাস করেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ভারতের সামাজিক অবস্থা-বৃত্তান্ত অল্পবিস্তর লিখিয়া যান। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—এই দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করেন; এবং বৌদ্ধদের কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী কেবল দয়াধর্ম্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান; কাহারো নিকট কিছু গ্রহণ করেন না; অপর কতকগুলি ধর্ম্মপ্রচারক লোকদিগকে নরকভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। কোন কোন সংস্কৃত নাটক হইতে এই বাক্যগুলির সত্যতার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত। চীনদেশীয় অনেক তীর্থযাত্রী তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। বুদ্ধগয়াতে তাঁহাদের খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে ও তাহার মধ্যে অনেকের নামও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল যাত্রীর মধ্যে ফাহিয়ান ও হিউ-এন্ সাং আমাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে মহান্

আবিস্ক্রিয়া—বুদ্ধজন্মভূমি কপিলবস্তুর স্থাননিরূপণ—এই দুই চীন পরিব্রাজকের লিখিত বিবরণই তাহার সাধনীভূত। ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন; এবং হিউএন্ সাং ৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয় লিখিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই গান্ধার, তক্ষশিলা, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, বৈশালী, মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দ, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত, কোশল প্রভৃতি বিবিধ স্থানস্থিত বিহার ও বিহারবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষুমণ্ডলী দর্শন করেন। হিউএন্ সাং তদতিরিক্ত প্রয়াগ, সারনাথ, উৎকল, কলিঙ্গ, ভরোচ, মালব, উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কাঞ্চীপুর, মলয়, কোঙ্কণ, গুজরাট, কচ্ছ, মূলতান, থানেশ্বর, প্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রায় সমগ্র ভারতভূমিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত দেখেন। কিন্তু ফাহিয়ানের সময় অপেক্ষা তাঁহার সময়ে এ ধর্ম্মের কিয়ৎপরিমাণে হীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল দেখা যায়। ফাহিয়ান যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ দেবালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত দেখেন, হিউএন্ সাং তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতিরিক্ত অন্যান্য বহুতর বৌদ্ধক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায়, বা একেবারে শূন্য দেখিতে পান, এবং কোন কোন স্থান ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অধীন হইতেছে দেখিয়া যান। ঐ সময় হইতে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকাল। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জা-

ধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্ব্বাবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়, মহীশূর, বিজয়নগর, আবু প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিত লিপিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সেইরূপ অবনতি হইয়া আসিল। এদিকে আবার হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার সহস্র-বৎসরব্যাপী ঘুমঘোর হইতে উত্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধন-ব্রতে কটিবদ্ধ হইলেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং তাহার পরেও কিছুদিন বৌদ্ধেরা যদিও ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অন্তর্হিত বোধ হয়।

পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্কর ও রামানুজ—ইঁহারা এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দুধর্ম্মপ্রণালীর প্রধান প্রবর্ত্তক। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একজন প্রবল বিপক্ষ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান। বেদভাষ্যকার সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভুত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধসম্প্রদায় সংহার উদ্দেশে এই আদেশ প্রচার করেন যে,—

আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্ন‍্পঃ॥

রাজা স্বকীয় কার্য্যকর্ত্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ না করে, তাহারা বধ্য।

শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের উত্তরকালীন লোক, তিনিও বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া প্রখ্যাত। যেরূপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার দত্ত তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। তিনি বলেন, চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ সাং সপ্তম খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে অনেক বর্ষ অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অন্য নানাবিষয়ে যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যদি হিন্দুসমাজে তাদৃশ ধর্ম্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। যখন ঐ ভ্রমণ-বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তর কালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যতদূর জানা গিয়াছে শাঙ্কর ভাষ্য রচনার কাল খৃষ্টাব্দ ৮০৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্ব্বাণ।

উপরে বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; এখন বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। শাক্যমুনি প্রবুদ্ধ হইয়া যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল (দ্বাদশ নিদান) ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেন, তাহার অর্থ কি? এই দ্বাদশ নিদানের অনুক্রম একের পর এক যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সাধারণের বিচার্য্য। মোটা-মুটি এই দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যা শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত,—অবিদ্যাই দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের সহিত এই বিষয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। বেদান্ত মতেও অবিদ্যা হইতে তাবৎ ভবযন্ত্রণার উৎপত্তি। এই মহারিপু দমন করা উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে বেদান্তের অবিদ্যা আর বুদ্ধের অবিদ্যা এক নহে। বৈদান্তিকেরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিদ্যার ব্যবধান দূর হইলে "সোঽহম্" বলিয়া যে অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেই জীবব্রহ্মে একীকরণ সংঘটিত হয়। অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মই জীব। অবিদ্যারূপ আবরণের উচ্ছেদ হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই আবরণচ্ছেদেই

মুক্তি। বুদ্ধের অবিদ্যা স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অবিদ্যা সেই, যাহা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সেই যত অনর্থের মূল। যদি কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রম অপনীত হইলে সর্পভয়ও দূর হয়—এও সেইরূপ। এই অবিদ্যার অপগমে দুঃখোৎপত্তির বাস্তবিক কারণ আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়। সেই কারণ কি—না বিষয়তৃষ্ণা—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি—আসক্তি হইতে জন্ম—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগ শোক দুঃখ কষ্ট। এই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। অবিদ্যা দূর হইলে তাহার নীচের বন্ধনগুলি একে একে টুটিয়া যায়; এক কথায়, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়, এবং নির্ব্বাণপথ উন্মুক্ত হয়।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতুর্ম্মহাসত্যের উপদেশ দিলেন, তাহাই বা কি? ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। (১) জীবের দুঃখ (২) দুঃখের কারণ (৩) দুঃখের মুলোচ্ছেদ (৪) তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপায় চেষ্টা। উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অষ্ট মহামার্গরূপ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্য মতের অনেক বিষয়ে পরস্পর ঐক্য দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কাপিল সাংখ্যদর্শন এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুদর্শন। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধ ও সাংখ্য উভয় মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; সেই

দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাণসাধন-চেষ্টা ঐ উভয় মত প্রবর্ত্তনেরই মূলসূত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু, বুদ্ধের মাতার নাম মায়া (প্রকৃতি)—এ দুইটিও সাংখ্য মতের পরিচায়ক। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে, বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে কপিল ছিলেন। শাক্যবংশীয় নৃপতিরা আপনাদের নগর নির্ম্মাণের স্থান-নিরূপণ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটীর দর্শন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, তিনি তাঁহাদিগকে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে নগর নির্ম্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবস্তু হইল। সে যাহা হউক, এই উভয় মতের যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তেমনি অনেকাংশে ভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। উভয়েই একস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন, উভয়েরই প্রস্থান ভূমি এক—মনুষ্যের দুঃখমোচন; কিন্তু গম্যস্থান স্বতন্ত্র এবং গন্তব্যপথও অনেক ভিন্ন। ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য, কিন্তু সে লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হয়? কপিল মুনি দুইটি মূলতত্ত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃতি আর পুরুষ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির অজ্ঞানরচিত আবরণ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায়; তখনি তিনি দুঃখক্লেশ, জন্মমৃত্যু

হইতে মুক্তিলাভ করেন। বুদ্ধ এ সকল তত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনিও বলেন সকলি অনিত্য—সকলি ক্ষয়শীল—সকলি দুঃখময়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের মূলে সত্যবস্তু কিছুই নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্ব্বাণ—বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানও নহে—সাংখ্যের আত্ম-তত্ত্বও নহে—কিন্তু নির্ব্বাণ, যার মূলার্থ নিবিয়া যাওয়া—অন্য কথায়, জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ। তাঁহার মতানুযায়ী এই নির্ব্বাণ-মুক্তি কি, তাহা পরে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যাহাই বলুন, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার নামে যে দর্শন-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা শূন্যবাদ বই আর কিছু নহে। আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, জগতের মূলকারণ ঈশ্বরও মিথ্যা।

কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশেষ বিধান ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সহজ ধর্ম্মনীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেব ন্যায়, সত্য, অহিংসাদি নীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া, ও সেই সমুদায়ই মানবকুলের সদ্গতিসাধক বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মেও দশানুশাসন প্রচলিত, তন্মধ্যে গৃহস্থ সাধারণের জন্য এই পাঁচটি নির্দ্দেশিত আছে—

প্রাণীবধ করিবে না।

পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না।

ব্যভিচার দোষ করিবে না।

মিথ্যা কথা কহিবে না।

সুরাপান করিবে না।

ভিক্ষুদের জন্য তদতিরিক্ত অপর পাঁচটি ব্যবস্থা আছে; যথা, অকালভোজন, নাট্যাদি দর্শন, উত্তম পরিচ্ছদ, প্রশস্ত শয্যা, মাল্যগন্ধ বিলেপন, ভূষণ ধারণ, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ, এই পঞ্চব্যসন হইতে বিরতি। উচ্চশ্রেণী ভিক্ষুদের জীবনব্রত যারপরনাই কঠোর। শ্মশানে যে-সকল ছিন্ন বস্ত্রাদি কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা আপন হস্তে সেলাই করিয়া পরিতে হইত; তাহার উপর এক গেরুয়া বসন। আহার যত সামান্য সাদাসিদা হইতে পারে, আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাদের ভিক্ষা-পাত্রে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্যোপায়ে ধনোপার্জ্জন নিষিদ্ধ। দিনের মধ্যে একাহার, মধ্যাহ্নের পর আহার নিষেধ। বনই তাহাদের আশ্রম, বৃক্ষতল তাহাদের আশ্রয়স্থান। সেখানে বড় জোর আসন বিছাইয়া বসিতে পার, কিন্তু কদাপি শয়ন করিবে না*—নিদ্রার সময়েও শয়ন নিষেধ। যদি কখন গ্রাম কিম্বা নগরে যাইতে হয়, সে কেবল ভিক্ষার জন্য—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইবে—কখন কখন শ্মশানে গিয়া সংসারের অসারতা চিন্তা ও ধ্যান ধারণায় রাত্রি যাপন করিবে—এই প্রকার কত কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত থাকিয়া তবে বৌদ্ধ ভিক্ষু 'অর্হৎ' পদবী লাভের অধিকারী হইতেন।

উল্লিখিত দশানুশাসনে যে-সকল পাপকার্য্য নিষিদ্ধ, তদ্ব্যতীত কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, পরনিন্দা, পরপীড়া প্রভৃতি

---

* বুদ্ধদেব শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রা যাইতেন।

মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ ও বিধান আছে। যে সমস্ত ধর্ম্মনীতি পালনীয়, তাহা পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, স্নেহ, দয়া, অহিংসা, চিত্তের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা। বুদ্ধের উপদেশ এই,—সত্য ও প্রিয়বাক্য কহিবে, কাহারো হিংসা করিবে না; সাধুতার দ্বারা অসাধুকে পরাজয় করিবে, সত্যদ্বারা অসত্যকে পরাজয় করিবে, মৈত্রী গুণে শত্রুতা পরাভব করিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও পাপের বিমোচন হয়; কিন্তু বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন,—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ ও তদীয় হিতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের অন্য উপায় নাই। হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহা মনুষ্যকুলের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম; কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই এ ধর্ম্মের বিরোধী নহে। দুঃখ ক্লেশ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল মনুষ্যেরই ভাগধেয়। গৌতমপ্রদর্শিত নির্ব্বাণপথের যাত্রীদিগের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতির মহত্ব নাই। জাতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে যে পার্থক্য, সে কল্পিত; কিন্তু গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যথার্থ পার্থক্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র জন্মিয়াই হয় না, হয় কর্ম্মগুণে। যিনি সদাচারী, শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানান্ধ পাপকারীই শূদ্র। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রোধপরায়ণ, হিংসারত, দয়ামায়া শূন্য, সেই চণ্ডাল। মাল্য চন্দন ভস্মলেপন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি

রিপুদল স্ববশে আনিয়াছেন, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইতিপূর্ব্বে চতুর্মহাসত্যরূপ ধর্ম্মচক্রের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রধান অঙ্গ। বারাণসীতে বুদ্ধদেব সেই তাঁহার প্রথম উপদেশে যে নির্ব্বাণমুক্তির আদর্শ ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই নির্ব্বাণপথের চারিটি বিভাগ বা সোপান আছে, এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দশরিপু সে পথের বিঘ্নকারী; সেই রিপুদল দমন করিতে করিতে পথিক এক এক ধাপে উপনীত হন, ও সমস্ত রিপুর উপর জয়লাভ না করিলে গম্যস্থানে পৌঁছান যায় না। তন্মধ্যে দুইটি ভয়ঙ্কর শত্রু, 'রূপরাগ' এবং 'অরূপরাগ'—এক বিষয়-বাসনা, অপর স্বর্গ-কামনা ;—এ দুইই অনর্থের মূল। শেষভাগে পৌঁছিয়া মৈত্রীর সহিত মিত্রতাবন্ধন হয়। সকল ধর্ম্মের শিরোদেশে—সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রেম ও মৈত্রীভাব। মৈত্রীভাবের দৃষ্টান্ত মাতৃস্নেহ। মাতা যেমন সন্তানকে প্রাণ দিয়াও পোষণ করেন, সেই উদার গভীর মাতৃপ্রেম—যে প্রেম শত্রুমিত্র আত্মপরে সমান—যে প্রেমের ভেরীনিনাদ দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, সেই প্রেম বিতরণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে বুদ্ধদেবের আগমন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, এই সার্ব্বভৌম মৈত্রীভাব জগতে বিস্তার উদ্দেশে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় নামক অন্যতর বুদ্ধের উদয় হইবে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে দয়া মায়া, ধৃতি সংযম, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, এই সকল গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকানেক নীতিকথা

আছে, তাহার একটি বলিয়া এই ভাগ শেষ করি। ইহা অশোক রাজার পুত্র কুনালের আখ্যান; কুনালচরিত্র ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার বিমাতা তিষ্য-রক্ষিতা তাঁহার শ্রীসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহাকে দূর দেশে নির্ব্বাসন করিয়া দেন, ও তথাকার রাজকর্ম্মচারীর প্রতি কুমারের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়, এইরূপ রাজ-নামাঙ্কিত এক আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন। কেহ এই অঘোর কৃত্য করিতে প্রস্তুত হয় না; অবশেষে একজন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডালের সাহায্যে এই নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যখন সেই ঘাতক সাড়াশী দিয়া তাঁহার দুই চক্ষু একে একে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তখন লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, কিন্তু রাজকুমার একটি কাতর শব্দ করিলেন না—চক্ষু দুটি হাতে লইয়া কহিলেন "আমার চর্ম্মচক্ষু গেল, তাহাতে কি? এখন আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল। রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমার রাজা ধর্ম্ম, তিনি কখনো আমায় পরিত্যাগ করিবেন না।" রাণী এই কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া কহিলেন, "মহারাণী আমার এত উপকার করিয়াছেন, তাঁর মঙ্গল হউক। আমি চক্ষু হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু যে ক্ষমা কারুণ্য শিক্ষা করিয়াছি, সেই আমার মহৎলাভ; তার তুলনায় এ ক্ষতি কিছুই নহে।" পরে তিনি ভিখারীর বেশে তাঁহার পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। এক রাত্রে রাজবাটীর সম্মুখে বীণা বাজাইয়া গান করেন, রাজা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই অন্ধকে দেখিয়া পুত্র বলিয়া

চিনিতেই পারিলেন না; পরে সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, রাণীকে বধ করিতে উদ্যত। কুনাল অনুনয়বিনয় করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! এমন কর্ম্ম করিবেন না, স্ত্রীহত্যা মহাপাপ। তথাগত উপদেশ দিয়াছেন, ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম। মহারাজ, আমার কোন কষ্ট নাই। যিনি আমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি। তিনি আমাকে সুখ দিন আর দুঃখকষ্ট দিন, আমার কাছে দুইই সমান। মাতার প্রতি আমার প্রেমভক্তি সমানই আছে। যদি আমার কথা সত্য হয়, আমার চক্ষু যেন ফিরিয়া পাই।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষুদ্বয় কোটরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভিধর্ম্ম ভাগ (দর্শন) যতই ভ্রান্তিসঙ্কুল ও জটিল হউক না কেন, বুদ্ধের নীতিশিক্ষার উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারিবে না। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করা যে নিতান্তই বৃথা কার্য্য, আর আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয়মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যে শ্রেয়ঃপথের একমাত্র দ্বার—এই কথাটীর প্রতি বুদ্ধদেব জনসাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। শুধু উপদেশ নহে, বুদ্ধের মহৎ জীবনই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা মহত্তর। বুদ্ধদেবের ধৈর্য্য, দয়া, মায়া, মমতা, প্রশান্ত গম্ভীর

ভাব, যেমন ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তিতে, তেমনি ভক্তদিগের মানসপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মবীর ছিলেন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঘোর বিলাসিতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া পিতৃ-গৃহের অতুল সুখসম্পত্তি কেমন অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া লোক-হিতার্থে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, পরে সাত বৎসর কি সুদুঃসহ তপঃসাধনবলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন, এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া কিরূপে ভারতে দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারে জীবন ক্ষেপণ করিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে, উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে, আনন্দমনে তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন, তখন আকাশবাণী হইল—হায়, বুদ্ধদেব অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল! বুদ্ধ-জীবনের ছবি আমাদের সকলেরই মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র অরাজক রাজ্য। বিশ্বসংসার অকাট্য নিয়মে বদ্ধ, অথচ তাহার নিয়ন্তা নাই—ধর্ম্মরাজ্যের কোন রাজা নাই। ফলাফলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন ব্যবস্থাপক পুরুষ নাই। পুণ্যের কেহ পুরস্কর্ত্তা নাই, পাপের শাস্তা নাই। দেবতা-প্রীত্যর্থ পশুবলি যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল, দেবারাধনা অনাবশ্যক।

বৌদ্ধধৰ্ম্ম সাধন-প্রধান ধৰ্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোনপ্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে, আত্মপ্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য হইতে বিনির্মুক্ত কর, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। সাধনেই সিদ্ধি—“দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা”—এই পুরুষকারই আমাদের মুক্তিপথের একমাত্র সম্বল। আমাদের আপনার মুক্তিসাধন আপনারই হস্তে—আত্মপ্রভাবে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুশয্যার শেষ কথাগুলি তাঁহার দুৰ্দ্ধর্ষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

“ভাই আনন্দ, আমার জীবনের অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছে—দিন ফুরাইয়া আসিল, আমি এইক্ষণে চলিলাম। দেখ আমি আত্ম-নির্ভরে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতেছি, তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তোমরাও আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শেখ। তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ—আপনারাই আপন নির্ভর-দণ্ড। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা ভিন্ন অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিও না। আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া শোক করিও না। আমার জীবন, ‘ধৰ্ম্ম’ ও ‘সঙ্ঘ’ এই যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা অক্ষয় ও অবিনাশী। সেই ধৰ্ম্ম তোমরা প্রাণপণে পালন কর। সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য আমি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তোমাদের জন্য ঔষধ আনিয়াছি—সেই ঔষধ

সেবন কর। আমার উপদেশ মনে রেখো, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়; সংসারের সকলি ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য। ইহা জানিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমরা নিজ নিজ মুক্তিসাধন কর। এইরূপে আত্মবলে আমার প্রদর্শিত পুণ্যপথে চল— নিশ্চয় তোমাদের কল্যাণ হইবে; তোমরা দুঃখশোক অতিক্রম করিয়া অপার শান্তি ও নির্ব্বাণরূপ অমূল্য নিধি লাভ করিবে।”

মানবপ্রকৃতির উচ্ছেদকারী, মনুষ্যসমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন এক অভিনব ধর্ম্মপ্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্থাপনে বৌদ্ধধর্ম্মের যেমন বল তেমনি দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাসনা-বিরহিত বনবাসী সন্ন্যাসী মিলিয়া মনুষ্যসমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বর-বিহীন ধর্ম্ম অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য আপনা অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে অক্ষম। আমরা এমন একজন জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষ চাই, যিনি আমাদের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিতে তৎপর— যিনি আমাদিগকে সংসারের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ—যিনি আমাদের সুখদুঃখে উদাসীন নহেন, যাঁহার নিকটে আমাদের সুখদুঃখ নিবেদন করিয়া আমরা ইহলোকে সুমতি পরলোকে সুগতি লাভে সমর্থ হই। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মপ্রভাব অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবপ্রসাদ ভিন্ন ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। মনুষ্যের আত্মা এই সংসারের দুঃখ দুর্গতি পাপতাপের মধ্যে শান্তি ও বিশ্রামের

স্থান অন্বেষণ করে—বিষয়কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই আনন্দস্বরূপের সহবাসে আনন্দরস পান করিতে উৎসুক হয়। "সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে স্ববশে আনিলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃত-রস পান করিলাম না, তবে সে সাধনের ফল কি? চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্য?" বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনের ধর্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোন ব্যবস্থা নাই, এই হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম অঙ্গহীন। এই কারণে কালসহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা জানাই আছে; তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কৃত হইবার কারণও এই। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি-প্রণালী যেমনই আবিষ্কৃত করুন, কিন্তু দেখা যায় অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্রে ঘোর পৌত্তলিকতা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সেই বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "প্রতিমা পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে। ফাহিয়ান খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্য বুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধদেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে।" এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ—ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং মূর্ত্তিপূজার আদি গুরু। বুদ্ধদেব যেমনি

পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তাহার কিয়ৎপরে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল, তার সাক্ষী (ইলোরা, অজন্তা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র; বুদ্ধগয়ায় তারাদেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈশালীতে ধ্যানী বুদ্ধ, অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশিরা, বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী) ইত্যাদি অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অনেক স্থানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপ্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রভাবের নিরতিশয় কঠোর সাধনার যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহা আর একদিক দিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মসাধন ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল। যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জ্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। "হিন্দু মতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে, ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধব্যক্তিরা অশেষরূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন,—যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, গৃহসম্বলিত পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্ব্বত ও পৃথিবীর গর্ভদর্শন, ইচ্ছাবলে বায়ুপ্রবাহ উৎপাদন, অগ্নিধারা আনয়ন, নষ্ট বা গুপ্ত সম্পত্তি উদ্গার করণ, ইত্যাদি।"

যদি জিজ্ঞাসা করেন বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব—তাহার বীজমন্ত্র কি? তাহার উত্তর "কর্ম্মফল"। কতকগুলি দর্শনতত্ত্ব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি—এ তত্ত্বটিও তাহারই মধ্যে একটি। সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে জীবের সদসদ্‌গতি, হিন্দু শাস্ত্রেরও এই শিক্ষা, এই উপদেশ—ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব নাই। কেহ রাজা কেহ চাষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ ধনী কেহ দরিদ্র—কেহ সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, কেহ অকারণ কষ্টভোগ করিতেছে—অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে; এরূপ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি? জীবনে এই দুঃখশোক, পাপতাপ, অন্যায় অত্যাচার—এ সকলেরই মীমাংসা "কর্ম্মফল"। ঐহিকে যে অমঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, পূর্ব্বজন্মকৃত ফলাফল সেই রহস্য ভেদ করে—সেই প্রহেলিকার উত্তর বলিয়া দেয়। তবে এই কর্ম্মের প্রাধান্য যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে, তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার মতে কর্ম্মোদ্যমই জীবন—কর্ম্মই দেবতার স্থলাভিষিক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সকলি ক্ষয়শীল, মৃত্যুর অধীন—কেবল কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। বুদ্ধের উপদেশ এই—"যেমন বীজ বপন করিবে, তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে।" কর্ম্মবন্ধন কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ মাত্র—ভৌতিক জগতে কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নাই। দেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি, আত্মা কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি; তাহাদের বাস্তব্য নাই। কর্ম্মই একমাত্র

সত্য পদার্থ, বিশ্বচরাচর কেবল কর্ম্মসূত্রে বাঁধা। বালকের কর্ম্মফল যুবার জীবনে প্রতিফলিত; সেইরূপ তোমার ঐহিকের কর্ম্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিফলিত হইবে। যেমন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল তুমি ইহজীবনে ভোগ করিতেছ, সেইরূপ যদি পরলোকে মঙ্গল চাও, তবে পাপকর্ম্ম পরিহার কর, পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; কেননা কোন চিন্তা, কোন বাক্য, কোন কর্ম্ম এ পৃথিবীতে নষ্ট হয় না। আমি সত্য বলিতেছি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানে যাও, সমুদ্রে প্রবেশ কর অথবা গিরিগুহায় লুক্কায়িত থাক, তোমার কর্ম্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখভোগ, সেইরূপ তোমার পুণ্যের সুফলভাগীও তুমি। বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয়স্বজনবন্ধু যেমন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ তোমার পুণ্য-ফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিবে।”

এইস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় যে-সকল প্রহেলিকা মানব হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাহার সন্তোষজনক উত্তর সর্ব্বাংশে উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। জীবাত্মার শেষ গতি কি? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন কি না?—এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই সমস্ত গূঢ়

প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত না; বুদ্ধদেব সে-সকলের যথা-সাধ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন—যাহার উত্তর নাই, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ যাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, এইস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা যাইতেছে।

মালুঙ্খ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব কহিলেন ঃ—

হে মালুঙ্খ্যপুত্র—আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি—"এস, আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন—বুদ্ধ মরণোত্তর নব-জীবন ধারণ করিবেন কি না?—এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি?"

—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ?

—না, তাহা নহে।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

"এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত—আগে আমাকে বল কার কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে? ফলে এই দাঁড়াইত যে, কথা শেষ হইতে না হইতেই

সেই বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

—হে মালুঙ্খ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক—যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক।"

বৌদ্ধদ্বেষীগণ এই মৌনভাববশতঃ বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মিলিন্দ প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌনভাবের কারণ সমালোচিত দেখিবেন।

রাজা কহিলেন—

—শাক্যমুনি বলিয়াছেন যে-সকল ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যবুদ্ধির গোচর তাহা আমি অপ্রকাশিত রাখি নাই। তথাপি দেখা যায় যে, মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে তিনি বিরত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ দুয়ের এক হইতে পারে—হয় অজ্ঞানবশতঃ উত্তর দেন নাই, অথবা জানিয়া শুনিয়া গুহ্য রাখিবার ইচ্ছায় উত্তর দেন নাই। এ দুয়ের কোনটা ঠিক?

—রাজন্, বুদ্ধদেব মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রশ্নবলির উত্তর দেন নাই সত্য বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানবশতঃ নহে। কোন প্রশ্ন এমন আছে, যাহার উত্তরে অন্য এক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে—আবার এমনও প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর। সে সকল প্রশ্ন কি?—না

জগৎ নিত্য কি অনিত্য ?

দেহ ও আত্মা এক কি স্বতন্ত্র ?

মৃত্যুর পরে তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না ?

এই সমস্ত প্রহেলিকা একপাশে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন উত্তর নাই—উত্তরে কোন লাভ নাই—এই সকল প্রশ্নের অনর্থক উত্তরদানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে উৎসুক ছিলেন না। যে-সকল দুরূহ সত্য মানববুদ্ধির অগম্য, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

জীবাত্মা অমর কিম্বা মৃত্যুর অধীন– মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতি কি হইবে? এই প্রহেলিকা ভেদ করা মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। অথচ আবার মানবজাতির জীবিতাশা ও সুখাশা এতাদৃশ বলবতী যে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সীমাবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হইবার নহে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই গভীর উচ্ছ্বাস আত্মা হইতে স্বতই উত্থিত হয় যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই হেতু পারলৌকিক আশার উদ্রেককারী আশ্বাসবচন প্রায় সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। কোরাণ ত স্বর্গবর্ণনায় ও স্বর্গসুখবর্ণনায় পরিপূর্ণ। খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও এ কথা আছে, আর তা ছাড়া খৃষ্টানেরা ঈশার সশরীরে স্বর্গারোহণ বিশ্বাস-বলে অনন্ত জীবন ও মুক্তি লাভের প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধ এ বিষয়ে কোন আশ্বাসবাক্য দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ঐহিক সুখবাসনার ন্যায় স্বর্গ কামনাও তাঁহার নীতিরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত। বুদ্ধ স্বয়ং অমর

জীবনের অধিকারী কি না,—তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কোশলরাজ ও সন্ন্যাসিনী ক্ষেমার মধ্যে যে কথোপকথন আছে তাহাতে ক্ষেমা স্পষ্টই বলিতেছেন—"স্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ করেন নাই, আমরা তাহা কি বলিব? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ গভীর। যদি বল বুদ্ধ অমর, তাহা ভুল—যদি বল তিনি মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে।" এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার উপর কাহারো কিছু বলিবার নাই। যে-সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগোচর, সে বিষয়ে মৌন থাকা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে থামিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায়, তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ স্বীকার করেন। ইহকালে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল পশুপক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে অশেষ জন্মচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের কথা তোমার আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকে না বুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরাই তাহাদের বিগত জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন। বুদ্ধদেব পশুপক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালায় বর্ণিত আছে। বুদ্ধজাতকে আত্মার নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখী

অভিব্যক্তি নাই—জীবনের ক্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না। কি কারণে, কি নিয়মে জীবের অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা বুঝা যায় না। আমরা দেখিতে পাই চারিবার তিনি মহাব্রহ্ম, বিশ বার ইন্দ্র—তিরাশীবার সন্ন্যাসী—আটান্নবার রাজা—চব্বিশবার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, শশক, মৎস্য, বৃক্ষ, চোর, বাজীকর, ভূতের ওঝা—এইরূপ কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধ নারীজন্ম গ্রহণ করেন নাই—ভূতপ্রেতরূপেও জন্মান নাই। সকল জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন, ও জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অশেষ দুঃখক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম কাহিনীতে বুদ্ধজীবন স্বার্থহীন পরোপকার ও দয়ার অবতাররূপে চিত্রিত; এবং এই সকল মহদ্গুণভূষিত তাঁহার সেই জীবনী মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপে জাতকমালায় বর্ণিত দেখা যায়। একস্থানে বুদ্ধদেব কহিতেছেন—"আমি 'সাম' নাম ধারণ করিয়া উপত্যকারণ্যে বাস করিতাম। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা আমি সকলকেই বশে আনিয়াছিলাম। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্যবরাহ মহিষ ইহারা সকলেই পালিত পশুর ন্যায় আমার কাছে আসিয়া বসিত। আমাকেও কেহ ভয় করে না, আমিও কাহাকে ভয় করি না, আমি দয়ার উপর পা রাখিয়া নির্ভয়ে পর্ব্বতপ্রদেশে বিচরণ করিতাম।"

যিনি পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহাকে কত প্রকার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়। বুদ্ধদেব

স্বীয় জীবনে সেইরূপ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধ যখন রাজকুমার বশ্বন্তর হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিপদের আর অন্ত ছিল না। বশ্বন্তর অন্যায়রূপে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। তাঁহার যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল—পরিশেষে চড়িবার রথটিও অশ্ব-সহ দানে ক্ষয় হইয়া গেল। স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্য দিয়া তিনি বনে ফিরিতেছেন। বালক বালিকা পথের মধ্যে বৃক্ষে ফল ঝুলিয়া আছে দেখিয়া তাহা পাড়িবার জন্য লালায়িত—বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্দ্দশায় সম-বেদনা অনুভব করিয়া অবনত হইয়া তাহাদিগকে ফল পাড়িতে দিতেছে। পরে তাঁহারা বঙ্ক পর্ব্বতে সন্ন্যাসীবেশে এক পর্ণগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। "আমি, রাজকন্যা মাদ্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা জালী ও কৃষ্ণাজিনা, এই কয়জন মিলিয়া সেই পর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলাম—পরস্পর পরস্পরের শোকাশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা অনুভব করিতাম। আমি ছেলে মেয়ে দুটির সংরক্ষণে আশ্রমে থাকিতাম, মাদ্রী বন হইতে ফল কুড়াইয়া আনিয়া আমাদের আহার যোগাইত। এই সময়ে একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার নিকট পুত্রকন্যা ভিক্ষা চাহিল। আমি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া ছেলেমেয়েদের দিয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। পরে স্বর্গ হইতে ইন্দ্র নামিয়া আসিয়া মাদ্রীকেও লইতে চাহি-লেন—আমার সতীসাধ্বী স্ত্রী, আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহার হস্তে জল রাখিয়া মাদ্রীকেও সন্তোষচিত্তে জলাঞ্জলি

দিলাম। এই দান দেখিয়া দেবতারা উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন—বনের তরুরাজি হইতে মেরু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমার পুত্র, কন্যা, রাজকুমারী সকলকেই আমি বুদ্ধত্ব পাইবার আশায় পরিত্যাগ করিলাম সেই মুনি-জন অভীপ্সিত মহামূল্য রত্নের নিকট এ সকল জিনিস কি ক্ষুদ্র—কি তুচ্ছ!”

দানশীলতার আর একটী আখ্যান শ্রবণ করুন। বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে একটী বিজ্ঞ শশকের গল্প আছে। বুদ্ধ বলিতেছেন ঃ—

“পূর্ব্বজন্মে যখন আমি শশক ছিলাম, পার্ব্বত্য অরণ্যে চরিয়া বেড়াইতাম। তৃণ পল্লব ফল মূল যাহা পাইতাম আহার করিতাম। এক বানর, এক শৃগাল, এক বিড়াল, আর আমি—আমরা এই চারি জনে মিলিয়া বনে বিচরণ করিতাম। আমার সহচরদিগকে আমি ধর্ম্মোপদেশ করিতাম - কি ভাল কি মন্দ তাহা শিক্ষা দিতাম—ভাল গ্রহণ করা, মন্দ পরিত্যাগ করা, এই-রূপ উপদেশ দিতাম। পূর্ণিমার উপবাসপর্ব্বে আমি তাহা দিগকে বলিতাম “এই পুণ্য দিনে ভিক্ষুকদিগের জন্য অন্নদানের সংগ্রহ করিয়া রাখ। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা দান করিবে ও আগে হইতে তাহাদের জন্য ভিক্ষাসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।” আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই উপ-লক্ষে কি দান করা যায়? কলাই মটর ডাল ভাত আমার কিছুই নাই। আমি তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা ত আর কাহাকেও দেওয়া যায় না। ভাল মনে পড়িয়াছে! কেহ আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে আমি আপনাকে দান করিব—তাহাকে

শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। শক্র আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ বেশে আমার বিবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন "ভিক্ষাং দেহি।" আমি কহিলাম, আপনি ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে—আমি আপনাকে এমন জিনিস দিব যে কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। মহাশয়, সাধু পুরুষ কাহাকেও অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিবেন না। আমার মিনতি যে, আপনি শুষ্ক কাষ্ঠসকল একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিন—আমি নিজে দগ্ধ হইয়া আপনার আহার যোগাইব।" ইন্দ্র আমার কথামত করিলেন এবং অগ্নির পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিলে আমি জ্বলন্ত অনলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জলপ্রবেশ করিলে যেমন অঙ্গদাহ নিবারিত হয়, সেই চিতানলে তেমনি আমার সকল কষ্টের অবসান হইল। অস্থি চর্ম্ম মাংস শিরা উদর হৃৎপিণ্ড সমেত আমার সমুদয় দেহ ভস্মসাৎ হইল; ব্রাহ্মণের হস্তে আমি অকাতরে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম কাহিনীর নমুনা স্বরূপ দুই একটী ক্ষুদ্র গল্প উপরে দেওয়া হইল—এই সকল নীতিপূর্ণ উপাখ্যানে জাতকমালা পরিপূর্ণ।

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধ মত জানিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মে আত্ম-তত্ত্বের শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আত্মার পারলৌকিক গতি ও মুক্তির কল্পনা আত্মার স্বরূপলক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মাকে যদি

দেহের সহিত অভিন্ন—মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ামাত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে নিষ্পন্ন হয়। এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে আকাশপাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, উপনিষদে আত্মা বলিয়া যাহা নিরূপিত, তাহা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন—আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, মনোবৃত্তি নহি—চক্ষু কর্ণ মনোবৃত্তি আমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা শ্রবণ করুন—

"এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি আত্মা, মন দিব্যচক্ষুস্বরূপ; আত্মাই এই মনোরূপ দিব্যচক্ষে কাম্যবিষয়সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্মা যতদিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সুখদুঃখে বিচলিত হয়েন; কিন্তু যখন তিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, তখন সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন অশরীরী বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ, আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতিকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন—তখনই তিনি পুরুষ—তখন সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া, বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, তখন তিনি পরম শান্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন।

উপনিষদের এই উপদেশ—বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ স্বতন্ত্র। যে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপর বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেহমনের আড়ালে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা এক। পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, কূট প্রশ্ন বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তরদানে বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর অবিশ্বাসের কথা আছে—অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

মিলিন্দ-প্রশ্ন হইতে নিম্নে যে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে আত্মতত্ত্ববিষয়ে বৌদ্ধমত স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনার নাম কি ?"

নাগসেন উত্তর দিলেন "মহারাজ! আমার নাম নাগসেন, কিন্তু নাগসেন নাম মাত্র, ইহা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার কোন বাস্তব্য নাই, কোন বিষয় নাই।"

রাজা—"কোন বিষয় নাই? বলেন কি? যদি কোন বিষয় না থাকে, কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দিয়া তোমার অভাব পূরণ করে? পীড়িত হইলে কে তোমাকে ঔষধ পথ্য দেয়? কে এই সকল বস্তু ভোগ করিতেছে? কে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, পুণ্যফল ভোগ করে? কে নির্ব্বাণ লাভ করে? চৌর্য্য হত্যা পঞ্চ পাপাদি কে করে? তোমার মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। পাপপুণ্যের ফলাফল নাই। কর্ম্মের কোন কর্ত্তা নাই। প্রভুজি, আপনাকে কেহ প্রাণে বধিলে তাহার হত্যাদোষ হয় না।"

তখন নাগসেন কহিলেন, "রাজন্, আমার কেশগুচ্ছ কি নাগসেন?

—তা নয়।

—বেদনা কি নাগসেন? নাম, রূপ, সংস্কার, বিজ্ঞান—ইহারা কি নাগসেন?

—না।

—তবে নাগসেন কোথায়? আমি যেদিকে দৃষ্টি করি নাগসেন নাই। নাগসেন একটি শব্দমাত্র।"

পরে আরও বলিলেন—

"মহারাজ! আপনি রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে পদব্রজে চলিয়া যাইতে শ্রান্তি বোধ করেন। এখানে আপনি পদব্রজে আসিয়াছেন, না রথে আসিয়াছেন"?

—আমি পায়ে চলিয়া বেড়াই না, রথে আসিয়াছি।

—যদি রথে আসিয়া থাকেন ত রথ কি, আমাকে বলুন। যুগকাষ্ঠখানা কি রথ? যুগকাষ্ঠ, চক্র, আসন, ইহার কোনটাই রথ নহে। এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগও রথ নহে। আমি যেদিকে দেখি, রথ নাই,—ইহা একটি শব্দমাত্র। মহারাজ! আপনি বলিলেন রথে আসিয়াছি—একি অসত্য নহে? যদি সত্য হয় ত রথ কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

—আমি যাহা বলিয়াছি সত্যাই বলিয়াছি,—যুগকাষ্ঠ, চক্র, চক্রনাভি, অর, আসন; এই সব মিলিয়া রথের নাম রথ।

—যদি তাহাই ঠিক হয়, নাগসেনও সেইরূপ। রূপ, বেদনা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এই সকল মিলিয়া তাহার নাম নাগসেন। তাহার আভ্যন্তরিক বিষয় আর কিছুই নাই। জীবাত্মা এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি।"

আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপনিষদ্ আর বৌদ্ধধর্ম্মের কি প্রভেদ দেখুন। বৌদ্ধমতে জীবাত্মা বলিয়া দেহ হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। জন্মসংস্কারে জীবন-স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে "আমি" "তুমি" কোন মূল সত্তা বিদ্যমান নাই।

এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আমার আমিত্ব চলিয়া আসে, অথবা বিনষ্ট হইয়া যায়? বৌদ্ধদর্শন ইহার উত্তর কি দেন?—এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য দীপশিখার সহিত আত্মার উপমা দেওয়া হয়। দীপশিখা যেমন বায়ুভরে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু আশ্রয় করিয়া জ্বলিয়া উঠে, জীব সেইরূপ এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে ভ্রমণ করে, এক দেহ ত্যাগ করিয়া

অন্য দেহ আশ্রয় করে। বায়ুর ন্যায় বিষয়-তৃষ্ণা জীবাত্মাকে যোনি হইতে যোনিতে লইয়া যায়। এই যে জীবাত্মা অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা একও নহে—ভিন্নও নহে।

রাজা—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।

—একটা দীপ জ্বালাইয়া দিলে সমস্ত রাত্রি তাহা জ্বলিতে থাকে। প্রথম প্রহরে যে শিখা জ্বলিতেছে, তাহা কি মধ্যরাত্রির শিখার সঙ্গে সমান ?

—না।

—মধ্যরাত্রির শিখা ও শেষ প্রহরের শিখা—ইহারা এক কি ভিন্ন ?

—এক নহে।

—তবে এই একই শিখার কি ভিন্ন রূপ বলিবেন ? তাহাও নহে, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখা জ্বলিতেছে। আমাদের জীবনেরও এই গতি,—এক যায়, এক আসে। আদি নাই, অন্ত নাই, জীবন-চক্র ঘুরিতেছে। পূর্ব্বাপর একও নহে, আবার ভিন্নও বলা যায় না।"

এই জীবন-শিখা কার্য্য-কারণগতিকে নূতন নূতন ক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। জ্বলিতেছে, জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে—নূতন ইন্ধন পাইয়া পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিতেছে—মনে হয় এক অথচ ভিন্ন, ভিন্ন অথচ এক।

জীবাত্মার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহার যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে ?

আত্মা ছাড়িয়া অনাত্মবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক সুখদুঃখভোগী যে জীব তাহার জীবন-সমস্যা পূরণ—বৌদ্ধধর্ম্ম এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

এই সমস্যা পূরণের প্রণালী এইঃ—বৌদ্ধমতে যে সমস্ত উপকরণে জীবের জীবন সংগঠিত, তাহাদের নাম "স্কন্ধ"। এই স্কন্ধ পঞ্চসংখ্যক, এই পঞ্চস্কন্ধ ন্যূনাধিক মাত্রায় সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান। সেই পাঁচটি এই—

বিষয় প্রপঞ্চ—রূপ;
বিষয়জ্ঞান প্রপঞ্চ—বেদনা;
সংজ্ঞা প্রপঞ্চ—নাম;
সংস্কার প্রপঞ্চ—বাসনা;
বিজ্ঞান প্রপঞ্চ—(consciousness)

প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অন্যতর নানাপ্রকার বিভাগ। এই পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জন্ম—তাহাদের বিয়োগে জীবের মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এই পঞ্চ স্কন্ধ কখন কখন 'নামরূপ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের সমষ্টিমাত্র। মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত—দৈহিক ও বাহ্য বিষয় রূপের অন্তর্ভূত।

মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবা-মাত্র অন্যত্র তাহাদের সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোক অথবা অন্য লোকে; এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্টি হয়। এই কয়েকটি

স্কন্ধের যোগাযোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের চরিত্র—মনুষ্যের আত্মা। এই সমস্ত স্কন্ধের মূলে আত্মা যে আমি, আমি কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই যে আমি, আমার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে; আজ একরূপ, কল্য অন্যরূপ। শিশু যে সে বালক নহে, বালক যে সে যুবা নহে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই দুগ্ধের পরিবর্ত্তনে ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। ইহাতে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—যদি আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের ভাল মন্দ যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে? আত্মা নাই ত যোনি ভ্রমণ কাহার? যেমন কথায় বলে, "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা!"—ইহার উত্তরে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে, যদিও আত্মার অন্য সমস্ত উপাদান (স্কন্ধ) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি কর্ম্মফল—কর্ম্মবল—অক্ষত থাকে। জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ করে। যে সকল সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য্য করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগকে বিয়োজিত করে, কিন্তু কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহ হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়বখণ্ড নূতন যোনিতে সংযোজিত হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এইরূপে জীবন-স্রোত অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বজন্ম ও নবজন্মের মধ্যে কর্ম্মসূত্রই একমাত্র বন্ধন। মনে করুন তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্ম্মবল বলিয়া একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে—সংসার চলিতেছে। যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা

স্থান নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা কিয়ৎকাল জ্বলিয়া নিবিয়া যায়—আবার জ্বলিয়া উঠে—তাহাকে পূর্ব্বাপর একই শিখা বলা যায় না, অথচ ভিন্নও নহে। এইরূপে কর্ম্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান—অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার অনুবর্ত্তিত্ব, আমার আমিত্ব অঙ্গীকার করেন না। আমার কর্ম্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তা কোন পুরুষ নাই। মোটামুটি, বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের সারাংশ এই—আত্মার পৃথক সত্তা নাই। দেহ এবং আত্মা ও আত্মার উপকরণ সমস্ত মৃত্যু দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কর্ম্মবলে সেই সকল ছিন্ন অবয়ব-খণ্ড সংসারের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে নূতন নূতন জড়পিণ্ড ও জীবাকারে পরিণত হইতেছে—বিশ্বসংসার এই অখণ্ডনীয় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। কোম্ত সম্প্রদায়ী লোকেরা (ইংরাজীতে যাদের Positivist বলে) তাঁদের মতও কতকটা এইরূপ। তাঁহারা ব্যক্তিকে—পুরুষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাহার স্থানে মনুষ্যজাতিকে সংস্থাপিত করেন। মনুষ্যের বিনাশ—কিন্তু মানব জাতির অমরতা। মৃত্যু-কালে মনুষ্যের দেহমন বিযুক্ত হইয়া আদি ভূতে মিশিয়া যায়; যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাঁহার সুকৃতি এবং সাধু দৃষ্টান্ত—অন্য কথায় কর্ম্মবল এবং কর্ম্মফল; তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী সন্তান সন্ততি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া জনসমাজ সংরক্ষণ এবং তাহার উন্নতি সাধনে সহায়ভূত হয়।

সে যাহাই হউক, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইতেছে, এই কর্ম্মবল কাহার? আমার, তোমার, কি অন্য কোন জীবের? আত্মা

বিনষ্ট হইলে কর্ম্মবল কিসের উপর স্বীয় শক্তি চালনা করিবে? কর্ত্তা ব্যতিরেকেই বা কর্ম্মবল কিরূপে দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে কার্য্য করিবে? বৌদ্ধধর্ম্মের সহস্র ব্যাখ্যাতেও এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ত্তা ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মের বল আপনাপনি বিনষ্ট হইয়া যায়; স্বাধীন পুরুষ ছাড়িয়া দিলে শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব চলিয়া যায়। পরকালে বিশ্বাসও এই আত্ম-জ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আমি আছি, আমি পরে থাকিব, আমার আমিত্ব নিরন্তর বহমান থাকিবে, এই বিশ্বাস পরকাল-বিশ্বাসের মূল। আমার আমিত্ব গেলে কর্ম্মবলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—পরকালে বিশ্বাসও হীনবল হয়।

তবে কি এই কর্ম্মনিবন্ধন জন্মের পাকচক্র হইতে জীবের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই? আছে, এবং বুদ্ধদেব সে উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন "যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে"। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের শেষফল নির্ব্বাণমুক্তি। এই নির্ব্বাণমুক্তি কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রশ্নে আসিয়া পড়িতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণের অনেক কথা, অনেক উপদেশ আছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ যে অবস্থা, তাহা ভাবাভাব এতদুভয়েরই অতীত এক অভাবনীয় অবস্থা—

"ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তঃ পদার্থো নির্ব্বাণমুচ্যতে।"

(রত্নকূট সূত্র)

মিলিন্দ-প্রশ্নে নাগসেনের নির্ব্বাণ-ব্যাখ্যার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ—শান্তি আনন্দ পবিত্রতা—এই নির্ব্বাণের অবস্থা।

যিনি স্বীয় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োজিত করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করেন, তিনি কি দেখেন? জন্ম রোগ শোক জরা মৃত্যু, চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন—সকলই অস্থির—সর্ব্বত্রই অশান্তি। এই দৃশ্যে তাঁহার শরীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, কিছুতেই তাঁহার সন্তোষ নাই, তৃপ্তি নাই, পুনঃপুনঃ জন্ম ভয়ে তিনি সদাই ভীত ও ত্রস্ত, এবং সেই ভীতিবশতঃ আরোগ্যলাভে অসমর্থ। এই অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন, এই জ্বালা যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যেখানে জন্মভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, বাসনার দংশন নাই, আসক্তিবিহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্ব্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হয়; সাধনা দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা উপলব্ধ হয়, যেখানে জন্মভয় শোক তাপ অতিক্রম করিয়া তিনি শান্তি লাভ করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন; সংযমী জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হন, সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ

করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অতীত যাহা স্থায়ী, যাহা সত্য, অর্হৎমণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল. তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তখনই তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন।

এই নির্ব্বাণমুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মই তাহার আশ্রয়স্থান। চীন, তাতার, কাশ্মীর, গান্ধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধুপুরুষ বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে চলিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী। যাঁহার চরিত্র পবিত্র, যিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি আসক্তি বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন।"

নাগসেন আবার কহিলেন, "নির্ব্বাণের যেমন স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না। যে পথ নির্ব্বাণে লইয়া যায়, সে পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে ; কিন্তু নির্ব্বাণের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বলা যায় না। আর জিনিসটা যে কি, তাও স্পষ্ট বলা যায় না।

—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে দাঁড়ায় এই, 'নির্ব্বাণ' কি না 'নির্ব্বাণ', অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়।

—মহারাজ তা নয়—নির্ব্বাণ আছে, ইহা সত্য।"

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ—অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"—আছেন" এ বলা ভিন্ন আর কিসে তিনি উপলব্ধ হন ?

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ

অবগত হওয়া গেল না। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় মৃত্যুভয় নাই, রাগ দ্বেষ স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকলই নষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে পারে? কাহার সাধ্য ভাবিয়া উঠে? কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা সে অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক্ এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জ্ঞানলাভ হয় কি না।

বুদ্ধদেব তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, "পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই অনিত্য, তোমরা যত্নপূর্ব্বক আপনারা আপন মুক্তি-সাধন কর।" এই কয়েকটি কথা তথাগতের শেষ কথা।

পরে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে পাদনিক্ষেপ করিলেন; প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে, তৃতীয় হইতে চতুর্থ সোপানে। তখনও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে। আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান-সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সেই সোপানে পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকাশের সোপান হইতে তথায় পদার্পণ করিলেন, যেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, কোন মনোবৃত্তি বিদ্যমান নাই—সকলি শূন্য। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। শূন্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট করা আবশ্যক। পরে শূন্যতার সোপান হইতে এমন

অবগত হওয়া গেল না। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় মৃত্যুভয় নাই, রাগ দ্বেষ স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকলই নষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে পারে? কাহার সাধ্য ভাবিয়া উঠে? কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা সে অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক্ এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জ্ঞানলাভ হয় কি না।

বুদ্ধদেব তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, "পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই অনিত্য, তোমরা যত্নপূর্ব্বক আপনারা আপন মুক্তি-সাধন কর।" এই কয়েকটি কথা তথাগতের শেষ কথা।

পরে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে পাদনিক্ষেপ করিলেন; প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে, তৃতীয় হইতে চতুর্থ সোপানে। তখনও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে। আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান-সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সেই সোপানে পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকাশের সোপান হইতে তথায় পদার্পণ করিলেন, যেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, কোন মনোবৃত্তি বিদ্যমান নাই—সকলি শূন্য। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। শূন্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট করা আবশ্যক। পরে শূন্যতার সোপান হইতে এমন

স্থানে উপনীত হইলেন, যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এই সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন স্থানে পৌঁছিলেন যাহা সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য, যেখানে সমুদয় মনোবৃত্তি তিরোহিত, যেখানে কোন ভাব-জ্ঞানও নাই, অভাব-জ্ঞানও নাই। এই শিখরদেশে পৌঁছিবার পর তিনি সোপানপরম্পরা দিয়া নিম্নদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম ধ্যান-সোপানে আসিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়বার উঠিতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ ধাপের উচ্চে আর উঠিতে পারিলেন না, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

বুদ্ধদেব উল্লিখিত প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বৌদ্ধমতে আমরাও সাধনাবলে, পুণ্যবলে, বিষয়তৃষ্ণা পরিহার করিয়া, সত্য সাধুতা স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়া, আমাদের জীবদ্দশায় অথবা পরলোকে এই নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভে জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি। বৌদ্ধেরা বলেন, অর্হন্মণ্ডলী নিজ নিজ পুণ্যবলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎ-চরিত্র বৌদ্ধদের আদর্শ চরিত্র। এই নির্ব্বাণাবস্থা জ্ঞান কিম্বা অজ্ঞানাবস্থা, চেতন কিম্বা অচেতন ভাব, বুদ্ধের উপদেশে তাহার ব্যাখ্যা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এ অবস্থা কার্য্য-কারণশৃঙ্খলের অতীত। এরূপ অবস্থা "নেতি "নেতি" ভিন্ন আর কোন্ শব্দে ব্যক্ত হইতে পারে? এখানে বাসনা ছিন্ন-মূল—দুঃখ ক্লেশ জ্বালা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি—এক কথায় আমার আমিত্ব লোপ। বৌদ্ধধর্ম্মে মনুষ্য জীবনের এই চরম ফল—এই শেষ গতি। এখন কথা এই যে, বেদোপনিষদের ব্রহ্ম অথবা বুদ্ধের

নির্ব্বাণ—আমাদের যথার্থ লক্ষ্যস্থান কি হইতে পারে? এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? নির্ব্বাণের অর্থ যদি শূন্যতা হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানবপ্রকৃতি এই শূন্যতা অবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য শূন্যতা চায় না, মনুষ্য পুরুষের আশ্রয় চায়। আমরা ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই, তার সাক্ষী এই বৌদ্ধধর্ম্মই দেখুন। বুদ্ধদেবই কি এ ধর্ম্মের প্রাণ নহেন? আরো দেখুন, ঈশার পুরুষকার খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বস্ব—ঈশাকে ছাড়িয়া দিলে খৃষ্টধর্ম্মের আর কি অবশিষ্ট থাকে? মহম্মদ বিহনে মুসলমান ধর্ম্ম কোথায় থাকে? চৈতন্য প্রভুর প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই বা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? এই সকল ধর্ম্মবীরেরাই মহাপুরুষ। এই সকল মহাপুরুষ সময়ে সময়ে অভ্যুদিত হইয়া মনুষ্যের অচেতন আত্মাকে সচেতন করিয়া তোলেন—দুর্গতি-প্রাপ্ত মনুষ্যসমাজকে উদ্ধার করেন। পুরুষ শব্দ পূর্ণতাব্যঞ্জক। ভক্তের উপাস্য দেবতা যে পরমাত্মা, তিনিও পুরুষ, তিনি পূর্ণ পুরুষ,—"জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ, আর অটল প্রশান্ত মহদ্বল এবং মহোদ্যমে পরিপূর্ণ।" আমি যে কথাগুলি বলিলাম, বৌদ্ধধর্ম্ম স্বয়ং তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধ ব্রহ্মকে স্বীয় ধর্ম্মমন্দিরে স্থান দান করেন নাই; তথাপি তিনি স্বয়ং যেমন অনেকানেক ভক্ত কর্ত্তৃক দেবতা রূপে পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ নির্ব্বাণের শূন্যতাও

স্বর্গসুখ-কল্পনায় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, শূন্যতা আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্মই টিকিতে পারে না।

আমার মনে অনেক সময় এই তর্ক উপস্থিত হয়—বৈদান্তিক মুক্তি আর বৌদ্ধ নির্ব্বাণ, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুই শুনিতে যত ভিন্ন, আসলে তত নয়। বেদান্ত দর্শন বলেন, নদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, জীবাত্মাও সেইরূপ মোক্ষাবস্থায় নিজত্ব ছাড়িয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। "বেদান্ত দর্শনের চৌতলা দেবমন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; চৌতলায় দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে; এ স্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান বা সমাধিস্থান। এ অবস্থায় জীব 'সোঽহম্' জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব লাভ করে—এখানে রোগ নাই, শোক নাই, 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।' বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরে নির্ব্বাণমুক্তিও ইহার অবিকল প্রতিচ্ছবি।" আসল কথা, এ অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—আমার আমিত্ব বজায় থাকিবে কিনা? যদি আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল, তবে আমি প্রস্তরে পরিণত হই, কিম্বা ব্রহ্মেতে বিলীন হই, অথবা নির্ব্বাণ-মহাসাগরে মিশিয়া যাই আমার পক্ষে সে একই কথা। আমি জানিতে চাই, আমার ব্যক্তিগত জীবন—আমার আমিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অথবা ক্রমোন্নতি সহকারে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরূঢ়

হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধীনতায় উন্নত হইবে? যদি জিজ্ঞাসা করেন 'আমি কি',—ইহা যুক্তি ও তর্কের কথা নহে, আমরা প্রত্যেকে অন্তরাত্মাতে জ্ঞানালোকে তাহা অনুভব করিতেছি। আমি জড় হইতে পৃথক্‌, অন্য জীব হইতে পৃথক্‌—এই পার্থক্য হইতেই আমার আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। আমার এই আত্মা, কর্ম্ম বাসনা প্রেম মমতা ও অনুরূপ সহস্র আকর্ষণের মধ্য দিয়া, এই ক্ষণ-স্থায়ী বাসগৃহে থাকিয়া দুঃখক্লেশের মধ্য দিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি যে অনন্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহাতে আমার আমিত্ব সুরক্ষিত থাকিবে; আমার নিজের শুভাশুভের জন্য আমি নিজেই দায়ী; আমার নিজের কর্ম্মফল আমি নিজেই ভোগ করিব; আমার পুণ্যফল পাপের ভোগ আমারই। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বেদান্ত দর্শন, এ উভয়ের উপ-দেশ অনুসারে যদি আমার আমিত্ব লোপেই মুক্তি হয়, তবে আমার পক্ষে এ দুইই সমান। ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কিম্বা মহানির্ব্বাণে আত্মার লয়, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম যদি এই অহমিকার উচ্ছেদে, এই আত্মঘাতে মুক্তি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে বুদ্ধের উপদিষ্ট সার্ব্বভৌম মৈত্রের আধার কোথায় মিলিবে? অন্যের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া দিলে কি প্রেমের মূল শুষ্ক হয় না? আসক্তিবিহীন প্রীতি—এ ত আমাদের কল্পনাতীত! মনুষ্য যদি কখন ঈশ্বরলাভে সমর্থ হয়, তবুও তাহার জীবনস্রোত পৃথক্‌ ভাবে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। মনুষ্যজন্ম দুঃখময় বলিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করা—কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া স্পন্দহীন অচল নিশ্চেষ্টতার

মধ্যে প্রবেশ করা—সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিম্বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া, ইহার পরিণামে মনুষ্যত্বের আর কি অবশিষ্ট রহিল? ভক্তি-ভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বৈদান্তিক চৌতলা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরের নির্ব্বাণ-মুক্তি এ-পিঠ ও-পিঠ।" বেদান্তমতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া—বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ-প্রলয়সাগরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই—অন্ধকার. নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ!

টিপ্পনী—বুদ্ধদেব বৈশালীর কূটাগার শালায় যে উপদেশ দেন তাহার ব্যাখ্যা।

চারিটী স্মৃতি-উপস্থান (ধ্যান)—

১। কায় অপবিত্র
২। সংসার দুঃখময়
৩। চিত্ত চঞ্চল
৪। পদার্থসমূহ অলীক

চারিটী ধর্ম্ম-চেষ্টা—

১। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ
২। অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন
৩। পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ
৪। নূতন পাপের অনুৎপত্তি

চারিটী ঋদ্ধিপাদ :—
অলৌকিক সিদ্ধি লাভের—

১। অভিলাষ
২। চিন্তা
৩। উৎসাহ
৪। অন্বেষণ

পঞ্চবল—

১। শ্রদ্ধা
২। সমাধি
৩। বীর্য্য
৪। স্মৃতি
৫। প্রজ্ঞা

সপ্ত বোধাঙ্গ—

১। স্মৃতি
২। বিবেক
৩। বীর্য্য
৪। প্রীতি
৫। শ্রদ্ধা
৬। বৈরাগ্য
৭। সমাধি

অষ্ট আর্য্যমার্গ—

১। সম্যক্ দৃষ্টি
২। সম্যক্ সঙ্কল্প
৩। সম্যক্ বাক্
৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত
৫। সম্যক্ আজীব
৬। সম্যক্ ব্যায়াম
৭। সম্যক্ স্মৃতি
৮। সম্যক্ সমাধি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ।

উপক্রমণিকা।—

বৌদ্ধধর্ম্ম ত্রিরত্নে খচিত—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মক্ষেত্রে এই তিনের ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত দেখা যায়। মুমুক্ষু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় এই ত্রিবর্গের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা লাভ করেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

—বৌদ্ধদের এই দীক্ষামন্ত্র।

সঙ্ঘ।—

এ পর্য্যন্ত 'বুদ্ধ' ও 'ধর্ম্ম', এই দুই অঙ্গ লইয়াই অল্প-বিস্তর চর্চ্চা করা গিয়াছে। বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এবং তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব যথাসাধ্য সমালোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় অঙ্গ যে সঙ্ঘ, এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা সঙ্গত বোধ হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র এই যে, মনুষ্যের জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; বিষয়-তৃষ্ণাই সে দুঃখের মূল, এবং বুদ্ধ-নির্দ্দিষ্ট আর্য্যমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তৃষ্ণা পরিহারই

সেই মূলোচ্ছেদের উপায়। এইরূপ বিশ্বাস ও উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের উৎপত্তি। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের উপদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করা গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হওয়া নির্ব্বাণ লাভের উৎকৃষ্ট সাধন; সহজ কথায়, নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে গেলে গৃহস্থের সন্ন্যাসী হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধদেব স্বয়ং মুণ্ডিত কেশে, গৈরিক বেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই জীবন-ব্রত অবলম্বন করিলেন, এবং স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা অন্যকে সেই পথে নিয়োজিত করিলেন। কাজেই তাঁর শিষ্যবর্গ মিলিয়া এক উদাসীন সম্প্রদায় স্বতই সংগঠিত হইল। বুদ্ধসম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু, এবং সমাজবদ্ধ ভিক্ষুদলের নাম সঙ্ঘ।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন হিন্দু সমাজ হইতেই বিনিঃসৃত, তখন সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, এই উদাসীন-সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের স্বকপোল-কল্পিত নূতন সৃষ্টি নয়। ইহার নিয়মাবলীর মধ্যে হিন্দুসমাজের রীতিনীতিবহির্ভূত অভিনব ব্যাপার কিছুই নাই। হিন্দুদের আদর্শ-জীবন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত। ইহার শেষ আশ্রম-বাসী যিনি, তিনি সন্ন্যাসী। বুদ্ধের সময়েও যোগী, বৈরাগী, যতী, মৌনী, নির্গ্রন্থ, অচেলক, আজীবক, দিগম্বর প্রভৃতি নানা ধরণের সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিল; তাঁহার প্রবর্ত্তিত উদাসীন-সম্প্রদায়ও উহাদের সহিত এক ছাঁচেই গঠিত। তবে ইহার বিশেষত্ব কোন্‌খানে, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

মধ্যপথ।—

অন্যান্য উদাসীন-সম্প্রদায়ের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের এক বিষয়ে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। শরীর-শোষণ, উপোষণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি কষ্টসাধন বুদ্ধদেবের অনুমোদিত ছিল না। তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণের পর ৭ বৎসর ধরিয়া তিনি ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। প্রথমে তিনি আলাড় ও রুদ্রক, এই দুই গুরুর নিকট যোগশিক্ষা করেন; তাহাতে কোন ফল না পাইয়া রাজগৃহ হইতে উরুবেলার বনে গিয়া আর পাঁচ জন সন্ন্যাসীসহ নিঃশ্বাস-রোধ, দীর্ঘ উপবাস, শরীর শোষণকারী অশেষ প্রকার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহার কমিয়া কমিয়া ক্রমে এক মুঠা চাউল, তাহাও রহিল না। শেষে একদিন এমন হইল যে চলিতে চলিতে মূর্চ্ছা গিয়া ভূতলে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর এই সমস্ত কঠোর সাধনা নিতান্ত নিস্ফল বিবেচনায়, তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। অনশন-ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আহারাদি দ্বারা শরীরে বল পাইলেন—তখন ধর্ম্মসাধনের অন্য পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধত্ব পাইবার পর তাঁহার বারাণসী বক্তৃতায় বলেন যে, একদিকে কঠোর তপস্যায় শরীর-ক্ষয়, অন্য দিকে আমোদ প্রমোদ বিলাসিতা,—তিনি এই উভয়ের মধ্য-পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। উপবাস বা শরীরশোষণ প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে, কিন্তু আত্ম-সংযম ও সত্যানুশীলনই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়; শরীরে বল না থাকিলে আত্মারও বলহানি হয়, বুদ্ধদেব তাহা পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন। বৌদ্ধ

শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের বীণাতন্ত্রীর সহিত সাদৃশ্য দেওয়া হয়—খুব জোরে বাঁধিলে তার ছিঁড়িয়া যায়, বেশী ঢিলা থাকিলেও সুস্বর হয় না। অতএব শারীরিক কষ্টকল্পনা ছাড়িয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টি করা—ধ্যানধারণা আত্ম-সংযম দ্বারা মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য সাধন করা—বুদ্ধ এইরূপ উপদেশ দিতেন। তাঁহার ভিক্ষুদল সেই উপদেশানুসারে চলিত। আহার বিহার বাস বসনে অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে তাহাদের চালচলন স্বতন্ত্র ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষান্নজীবি ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কোন অন্নকষ্ট ছিল না। স্বহস্তসূত চীরপুঞ্জ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগম্বরের ন্যায় বিবস্ত্র থাকিতেন না—ত্রিবসনমণ্ডিত সুরুচিসঙ্গত ভদ্র সাজে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। কথিত আছে যে, একদিন অনাথপিণ্ডদের বাড়ী একদল জটাধারী, ভস্ম-বিভূতিমাখা, বীভৎস নগ্ন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার স্ত্রী আপন পুত্রবধূ সুমাগধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আসিয়া দেখ কেমন সন্ন্যাসী আসিয়াছে।" সুমাগধা ভাবিলেন সারীপুত্র কি আর কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিতে পাইবেন; এই মনে করিয়া মহোল্লাসে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখেন, একি অদ্ভুত দৃশ্য! এই সকল বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চক্ষু স্থির! অমনি বিমর্ষ ভাবে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় বিষণ্ন দেখিতেছি কেন?" তিনি বলিলেন, "এই সকল ভিক্ষু যদি সাধু হয়, তবে না জানি দুর্জন কাহাকে বলে?"

সঙ্ঘের গঠন—দলাদলি।—

এই উদাসীন সম্প্রদায় যে কঠোর সামাজিক শাসনতন্ত্রে বদ্ধ ছিল, তাহা নহে। রাজার ন্যায় কোন শাসনকর্ত্তার উপর সঙ্ঘের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল না; সুশাসন উদ্দেশে ঐ সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি সভাও সংস্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধদেব মঠপতি সদৃশ আপনার কোন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই, তাঁহার মরণান্তর তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। আনন্দ তখন রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু সেখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ করেন, ও তাঁহার প্রধান অমাত্য এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "বুদ্ধদেব কি তাঁহার কোন শিষ্যকে আপন উত্তরাধিকারীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন?" আনন্দ তাহার উত্তরে কহিলেন—না। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্ঘ হইতে কি কোন একজন ভিক্ষু মঠাধিকারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন?" তাহার উত্তরেও তিনি বলিলেন "এরূপ কোন ভিক্ষু নিযুক্ত হন নাই।"—"যদি তোমাদের কোন পথপ্রদর্শক না থাকেন, তবে তোমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের উপায় কি?" উত্তর—"আমাদের সে আশ্রয়ের অভাব নাই, আমাদের শরণ—ধর্ম্ম।" ভিক্ষুদল যে সমস্ত আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন, তাহা ভগবান বুদ্ধের আদেশ বলিয়া প্রচারিত হইত। বুদ্ধই ভিক্ষুদলের দলপতি—তাঁহার আদেশ, তাঁহার উপদেশ ও অনুশাসন ভিক্ষুদের সকলেরই মাননীয় ও পালনীয়। তিনি

যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার শাসন অনতিক্রমণীয় ছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর সে শাসনের বল ছিল না, তখন তাঁহার নিয়মভঙ্গ নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল ভিক্ষুসভা আহ্বান করিয়া তাহাদের মন্ত্রণা গ্রহণ; এই উদ্দেশ্যেই রাজগৃহ ও বৈশালীতে বৌদ্ধসভা হয়। কিন্তু এই সকল সভার স্থানীয় অধিকার ভিন্ন অধিক কিছু কল্পনা করা যায় না। সে সভার শাসন-বল কতটা? সে সভার মতামত সাধারণ বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত করিবার উপায় কি ছিল? তাহার কোন নিয়ম জারি হইলে তাহা যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করে, সে অন্যকথা—কিন্তু না করিলেই বা কি? বুদ্ধদেবের মৃত্যুতে সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যেমন শোকধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এই কথাও শুনা গেল—"আঃ! গৌতম গেল, বাঁচা গেল। এখন আমরা মনের সাধে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিব, আমাদের শাসন করিবার জন্য কোন গুরুমহাশয় নাই।" এই কথা শুনিয়া কাশ্যপের মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল, ও তাঁহারই মন্ত্রণায় ভিক্ষুসভা বসিল। কিন্তু তাহার বিধান মানে কে? এইরূপ কথিত আছে যে, রাজগৃহের সভাস্থলে স্থবির ভিক্ষু পুরাণ উপস্থিত ছিলেন না। সভা ভঙ্গের পর তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে বলা হইল—"হে পুরাণ, স্থবিরদের মতে এই যে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অনুমোদন করিতে আজ্ঞা হউক।" পুরাণ কহিলেন "তাঁহারা শাস্ত্র বাঁধিয়াছেন ভালই, কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধ ভগবানই

আমার গুরু; তাঁহার মুখে আমি যে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, আমি তাহাতেই অনুরক্ত থাকিব।” বৈশালীর সভাও এই দলাদলি হইতে উৎপন্ন। কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্ঘনিয়মেব কঠোরতা নিবারণ জন্য কোন কোন নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা এইরূপ দশটি নিয়ম নির্দ্দেশ করেন—অশন বসন সম্বন্ধে কতকগুলি ছোটখাট নিয়ম, তাছাড়া সোনারূপা গ্রহণের যে নিষেধ ছিল, তাহা দূরীকরণ। এই সকল বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্কের পর নবীন মত অগ্রাহ্য হইয়া সঙ্ঘের প্রাচীনপন্থীদের মর্য্যাদাই রক্ষিত হইল। তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারাও স্বপক্ষ হইতে এক সভা করিলেন—এই সভা ‘মহাসঙ্গীতি’ বলিয়া অভিহিত। এই বিপক্ষ দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দীপ-বংশ বলেন—“ইহারা ধর্ম্মনষ্ট করিতে ও শাস্ত্র উল্টাইতে চায়—বুদ্ধের উপদেশের নূতন অর্থ করিয়া স্বমত সমর্থন করে—সূত্র বিনয় ও পরিবার পাঠ, অভিধর্ম্ম, নিদেশ, জাতক প্রভৃতি একদিকে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া শাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে উদ্যত।” বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মতভেদ দলাদলি আরো বাড়িয়া উঠিল—ক্রমে বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল—তাহাদের গুরুও ভিন্ন ভিন্ন। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রতিকূলে বুদ্ধের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা, বৌদ্ধশাস্ত্রে আস্থা, ধর্ম্মবন্ধনে সাধারণ অনুরাগ ও উৎসাহ—এ ভিন্ন আর কোন শক্তি ছিল না। ভারতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ নির্ম্মূল হইবার এক কারণ মনে হয় সঙ্ঘের এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা ;

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই এইরূপ মতভেদের সূত্রপাত দেখা যায়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণ হইবে; আমরাও আমাদের এখনকার সমাজের বিচ্ছেদ দলাদলি দূর করিবার সদুপায় স্থির করিতে পারিব।

যখন ভগবান্ বুদ্ধ কৌশাম্বীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর প্রতি অকারণে দোষারোপ করা হয়, কিন্তু তিনি নিজ দোষ কিছুতেই স্বীকার করেন না; ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বহিষ্কার দণ্ড বিধান করে।

সেই ভিক্ষু বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ এবং বিনীত-স্বভাব ছিলেন। তিনি নিজ বন্ধুগণের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি ত কোন দোষ করি নাই, আমাকে অনর্থক দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। আমি আপনাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত মনে করিতে পারি না। আপনারা আমাকে এই অন্যায় দণ্ড হইতে মুক্তি দান করুন।"

তাঁহার বন্ধুগণ বিচারকদের নিকট গিয়া আপনাদের অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলে পর, দুই দলের মধ্যে ঘোরতর কলহ-বিবাদের উপক্রম হইল।

বুদ্ধের নিকট ইহার মীমাংসার জন্য উভয় দলই উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব দু'পক্ষকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, ও যাহাতে সদ্ভাব রক্ষিত হয়, তাহার উপদেশ দিলেন।

তবুও দলাদলি ভাঙ্গে না। উভয় পক্ষ স্বতন্ত্রভাবে উপবাস প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইল। বুদ্ধদেব তাহ

দেখিয়া বলিলেন, দুই দলের মধ্যে যখন ঐক্য নাই, তখন তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। তিনি বিবাদের সূত্রধরদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাহত হয় না, কিন্তু প্রেম-গুণে বিজিত হয়। অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কিছু বলিবার নাই; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এইরূপ অসদ্ব্যবহার দূষণীয়। তোমরা সকলে শান্তি ও সদ্ভাবে বাস করিতে শিক্ষা কর, এই আমার উপদেশ। আর তা না পার ত বনে গিয়া নির্জ্জনে বাস কর। দুষ্টের সহবাস অপেক্ষা অরণ্যের নির্জ্জনতা শতগুণে শ্রেয়স্কর।"

এইরূপ উপদেশেও ভিক্ষুদলের বিবাদ ভঞ্জন না হওয়াতে, ভগবান বুদ্ধ কোশাম্বী পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই কলহ-বিবাদ আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে কৌশাম্বীর গৃহস্থেরা স্থির করিল, "এই সকল ভিক্ষু মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, ইহাদের দৌরাত্ম্যে বুদ্ধদেবও দূরে গমন করিলেন। এই সকল ভিক্ষুদিগকে আমরা আর ভিক্ষা দান করিব না। ইহারা গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত নহে—ইহারা সংসারে ফিরিয়া গেলেই ঠিক হয়।" গৃহীদের এইরূপ আচরণে ভিক্ষুদলের চৈতন্য হইল, ও তাহারা তখন পরস্পরের মধ্যে শান্তিস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইল।

উভয় পক্ষের লোকেরা শ্রাবস্তী গিয়া উপস্থিত হইল। সারীপুত্র বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! এই

সকল কলহপ্রিয় ভিক্ষুদল সমাগত হইয়াছে, ইহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব ?

বুদ্ধদেব কহিলেন ঃ—

"ইহাদিগকে ভর্ৎসনা করিও না—কর্কশবাক্য কাহারো ভাল লাগে না। উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার কর। এক পক্ষের কথা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা অসম্ভব। উভয় পক্ষের দোষগুণ প্রণিধানপুরঃসর বিচার করা মুনির লক্ষণ।"

কুলস্ত্রী প্রজাপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ?

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, "উভয় দলকেই গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া পরিতুষ্ট কর—কোন এক দলের প্রতি পক্ষপাতী হইও না।"

উপালী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহাদের কলহের ব্যাপার তদন্ত না করিয়া কি ইহাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন বিধেয় ? বুদ্ধ কহিলেন—"না, এরূপ হইতে পারে না। অনুসন্ধান দ্বারা ইহাদের দোষগুণ বিচার করিয়া এর শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া না দেখিলে সন্ধিস্থাপনের উপায় নির্ণয় করা অসাধ্য। মৌখিক সন্ধি কোন কার্য্যের নহে—অন্তরের সহিত পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা না করিলে স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা বৃথা। এক মৌখিক সন্ধি—অন্য যে আন্তরিক সখ্য-বন্ধন, তাহাই প্রকৃত সন্ধি।" এই বলিয়া তিনি দীর্ঘায়ুর গল্প বলিলেন ঃ—

পুরাকালে কাশীতে ব্রহ্মদত্ত নামক এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘেতি নামক কোশল রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ তিনি মনে ভাবিলেন

কোশল এক ক্ষুদ্র রাজ্য—দীর্ঘেতি আমার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিবে না। দীর্ঘেতি নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কাশী আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসীবেশে এক কুম্ভকার-গৃহে রাণীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাণীর এক সন্তান জন্মিল, তাহার নাম দীর্ঘায়ু। দীর্ঘায়ু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিলেন।

যখন ব্রহ্মদত্ত জানিতে পারিলেন যে, কোশলরাজ ছদ্মবেশে রাণীর সহিত কুম্ভকার-গৃহে বাস করিতেছেন, তখন তিনি তাহাদের উভয়কে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

তাঁহাদের পুত্র দীর্ঘায়ু কাশীর বাহিরে বাস করিতেছিল, তাহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে আনাইয়া উপদেশ দিলেন—"হে পুত্র দীর্ঘায়ু, অধিক দেখিও না—অল্প দেখিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাজিত হয় না—মৈত্রীগুণে হিংসাকে পরাজয় করিবেক।"

দীর্ঘায়ু বনে গমন করিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নগরে ফিরিয়া আসিয়া নৃপতির হস্তী-রক্ষকের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে পরিজনেরা বালকটীকে রাজার নিকট লইয়া গেল; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার পার্শ্বচর করিয়া রাখিলেন।

একদিন রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়া তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন—সঙ্গে কেবল দীর্ঘায়ু রহিল। দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া রাজা নিদ্রা গেলেন।

দীর্ঘায়ু মনে মনে ভাবিলেন, রাজা আমাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন—আমার পিতা মাতাকে হনন করিয়া আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন তাহার প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি কোষ হইতে তরবারি উন্মোচন করিলেন।

তখন পিতার শেষ কথাগুলি দীর্ঘায়ুর স্মরণ হইল—স্মরণ করিয়া আবার খড়গ কোষমধ্যে রাখিয়া দিলেন।

রাজা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজা কহিলেন, "আমার কখনই সুনিদ্রা হয় না, আমি সর্ব্বদাই এই দুঃস্বপ্ন দেখি যে, দীর্ঘায়ু তরবারি হস্তে আমাকে মারিতে আসিতেছে—দেখিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছি, এই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠিলাম।"

তখন যুবক বাম হস্ত রাজার মস্তকে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়গ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমিই দীর্ঘায়ু, দীর্ঘেতি রাজার পুত্র—আমার পিতাকে হনন করিয়া আপনি তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছেন। দেখুন এখন প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে।"

রাজা আপনাকে অরক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, "হে

দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও—আমাকে বাঁচাও—প্রাণে মারিও না।”

দীর্ঘায়ু বলিল—“কেমন করিয়া আপনার প্রাণদান করিব, যখন আমার নিজের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত। যদি আপনি আমাকে অভয়বচন দেন, তাহা হইলে আমিও আপনার প্রাণ রক্ষা করিব।”

রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন, “তুমি আমার প্রাণদান কর, আমিও তোমাকে অভয়বচন দিতেছি।”

পরে তাঁহারা পরস্পর হাতে হাত দিয়া বন্ধুত্ব শপথ করিলেন।

ব্রহ্মদত্তকে দীর্ঘায়ু তাঁহার পিতার শেষ উপদেশগুলি ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা মৃত্যুকালে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?—“অধিক দেখিও না, অল্প দেখিও না, হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না।”

দীর্ঘায়ু কহিলেন—“অধিক দেখিও না, অর্থাৎ হিংসা অধিক কাল মনে স্থান দিও না। অল্প দেখিও না, অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ অল্পে হইতে দিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা নিবারিত হয় না, তাহার অর্থ এই,—তুমি আমার পিতা মাতাকে বধ করিয়াছ, আমি যদি তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তোমাকে হত্যা করি, তাহা হইলে তোমার পক্ষের লোকেরা তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া আমাকে বধ করিবে, ও আমার পক্ষের লোকেরা তাহার শোধ তুলিবার চেষ্টায় ফিরিবে;—প্রতিহিংসা দ্বারা

হিংসা জিত হয় না। মহারাজ! এখন তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমিও তোমাকে প্রাণদান করিলাম,—অহিংসা দ্বারা হিংসার পরাজয় হইল।”

ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার রাজ্য অশ্ব রথ সেনা সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! বড় লোকেদের এই দৃষ্টান্তে তোমরাও ক্ষমা দয়া অভ্যাস কর; গুরুজনকে ভক্তি কর, সকলকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখ। তোমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না, শান্তি ও সদ্ভাবে মিলিত হইয়া বাস কর,—এই আমার উপদেশ। আশীর্ব্বাদ করি যে গৃহস্থেরা তোমাদের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুখী হউক।

ভগবান বুদ্ধ গল্পচ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিয়া ভিক্ষুদিগকে বিদায় করিলেন।

ভিক্ষুদল মিলিত হইয়া তাহাদের বিবাদ কলহ মিটাইয়া ফেলিল, ও সেই অবধি তাহারা সুখে সদ্ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল। সঙ্ঘের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল।

বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড—পৌরোহিত্য।—

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব কালে আর্য্যসমাজে বলি, হোম, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ প্রবহমান ছিল, এবং এই সকল কর্ম্ম কাণ্ডের অধিনায়ক হোতা ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পুরোহিত বিদ্যমান ছিলেন। এই আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম্ম ও পৌরোহিত্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-ভিত্তির উপর

বুদ্ধদেব তাঁহার সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, বিশেষতঃ পশুবলির প্রতি কিরূপ বীতরাগ ছিলেন, তাহার নিদর্শন বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিষয় লইয়া এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়, তাহাতে বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দেন :—

পুরাকালে এক মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন, তিনি এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কুল-পুরোহিতকে ডাকিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন।—এই পরামর্শক্রমে রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া, পরে তিনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন। সে যজ্ঞে কোন পশু হত্যার ব্যবস্থা নাই! কোন বৃক্ষচ্ছেদন, একটী তৃণেরও উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজন হইল না। ভৃত্যেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেল। ক্ষীর দুগ্ধ মধুপর্ক—এই সমস্ত বলিতে যজ্ঞের কার্য্য সমাধা হইল। কিন্তু বুদ্ধ কহিলেন, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর বলি আছে, অথচ তাহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য—সে কি, না ভিক্ষুদিগকে অন্নদান, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্য আশ্রমনির্ম্মাণ। ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলি, যখন ভক্ত আসিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়, যখন তিনি কোন প্রাণীহিংসার প্রশ্রয় দেন না, তাঁহার প্রতাপে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুদূরপরাহত হয়; যখন তিনি ভিক্ষুর ন্যায় সুখদুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হয়েন। কিন্তু সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি, যখন তিনি দুঃখ শোক হইতে

উত্তীর্ণ হইয়া, জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া জ্ঞাননেত্রে এই নির্ব্বাণাবস্থা অনুভব করেন ও জানিতে পারেন "আর আমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।"

বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তখনি বিনীত ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞ করিবার মানসে অনেক পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধকে কহিলেন—

"দেখুন, আমি এই সকল জীবকে মুক্ত করিয়া দিলাম,—ইহারা মনের সুখে চরিয়া বেড়াক্—মুক্ত বায়ু ইহাদিগকে ব্যজন করুক।"

এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের উপদেশে রাজা বিম্বিসার তাঁহার রাজ্যে যজ্ঞে পশুহত্যা উঠাইয়া দিয়া প্রচার করিয়া দিলেন "এখন হইতে যজ্ঞে আর পশুবলি হইবে না—পশুদের প্রতি মনুষ্য সদয় হইলে, দেবতারা মনুষ্যের প্রতি সদয় হয়েন।"

পুরোহিতের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে পৌরোহিত্য কাজেই চলিয়া যায়—বৌদ্ধ সঙ্ঘেও তাহাই দেখা যায়। গুণ ও বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রাধান্য ছিল—বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম বয়সে তাহার মধ্যে পৌরোহিত্যের প্রভাব উপলক্ষিত হয় না। সে প্রভাব কেনই বা থাকিবে? যে ধর্ম্মে দেবতার আসন নির্দ্দিষ্ট নাই—শান্তি স্বস্ত্যয়নের বিধান নাই—যে ধর্ম্মে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম ভজন পূজনের কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই—সে ধর্ম্মে পুরোহিত কিসের জন্য? যাগ যজ্ঞের অধীশ্বর, দেব মানবের মধ্যস্থ এরূপ কোন কার্য্যকর্ত্তার কিছুই প্রয়োজন নাই।—বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক

মনুষ্য নিজ পুণ্যপ্রভাবে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী, প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভর-যষ্টি। প্রত্যেক বৌদ্ধ ভিক্ষু আপনিই আপনার পুরোহিত, আপনিই আপনার যজমান। বুদ্ধদেব মুমুক্ষুমাত্রকেই সংসার ও গৃহ সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু সাধকের মোক্ষলাভ নিজের যত্ন চেষ্টা ও সাধনার উপরেই নির্ভর।

এই নিয়ম যাহা বলা হইল তাহা আদি বৌদ্ধ সমাজে খাটে, কালসহকারে ও স্থানবিশেষে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে সঙ্ঘের আকার প্রকার নিয়ম বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী লামাদের মধ্যে ইহা যে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের অনুমোদিত কে বলিবে? আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মণ্ডিত পণ্ডিত-পুরোহিত, সমস্বরে ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, ধূপ ধূনা ঘণ্টার ঘটা, বৃহৎ মঠ মন্দিরে পট পুত্তলী প্রতিষ্ঠা, শান্তিজল সিঞ্চন, উপোষণ ও গুরু সন্নিধানে আত্মদোষ স্বীকার, পার্গেটরি-সদৃশ নরকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ, সেণ্ট-প্রতিম বোধিসত্ত্ব কল্পনা, পোপের স্থানীয় ধর্ম্মযাজক লামার অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্ম মূলধর্ম্ম হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে,—বরং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের সহিত উহার সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

জাতি বিচার।—

বর্ণাশ্রমের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পর্ক কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক।

যদিও জাতিভেদ প্রথা উন্মূলিত করিয়া হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেলা বুদ্ধদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্ণবিচার তাঁহার সমাজের পত্তন-ভূমি নহে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্গের ন্যায় নীচ বর্ণের লোকেও ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারী। বুদ্ধদেব একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ—যেমন গঙ্গা যমুনা মহী অচিরাবতী প্রভৃতি নদনদী যেমনই হউক না কেন, সাগরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ পুরাতন নাম ধাম হারাইয়া একই সাগর নাম ধারণ করে, তেমনি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ আমার বিধানানুসারে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন তাহারা পূর্ব্ব বংশ-মর্য্যাদা পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু নামেই অভিহিত হয়।" রাজা অজাতশত্রুকে সন্ন্যাসধর্ম্মের উপদেশ প্রদান কালে বুদ্ধ বলিতেছেন—"যদি কোন রাজভৃত্য বা অনুচর গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী হইয়া ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করে, হে রাজন্, তখন কি তুমি বলিবে এ আমার ভৃত্য—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে—প্রণতভাবে আমার আজ্ঞাধীন থাকিবে—সকল সময় আমার কথামত চলিবে—আমার সেবা-তৎপর থাকিবে?" রাজা উত্তর করিলেন, "প্রভো! তাহা নহে—আমিই তাঁহার নিকট প্রণত হইব—তাঁহাকে বসিবার আসন দিব—তাঁহাকে অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য যখন যাহা আবশ্যক তাহা দান করিব—তাঁহার সকল অভাব মোচন করিয়া, যাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকেন তাহার উপায় বিধান করিব।"

বুদ্ধ-শিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী, তাহা নহে—সুর নর, উচ্চ নীচ সকলেরই কল্যাণ উদ্দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত।

বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদলের মধ্যে আমরা রাজনাপিত উপালীর নাম দেখিতে পাই। হীন অস্পৃশ্য জাতি হইতেও যে তাঁহার সঙ্ঘ পুষ্টিলাভ করিত, এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। থেরাগাথায় সুনীত নিজ কাহিনী যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

"নীচকুলে আমার জন্ম, আমি দীন দরিদ্র অজ্ঞান ছিলাম, মন্দিরের শুষ্ক ফুল ঝাঁট দিয়া মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা—এই আমার কাজ। লোকে আমায় হেয়জ্ঞান করিত, আমি বড়লোকের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইতাম। ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণসহ মগধের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার দর্শন লাভ মানসে আমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলাম। আমায় দেখিয়া তিনি কৃপালু হইয়া ক্ষণেকের তরে দাঁড়াইলেন। রাজাধিরাজতুল্য কোথায় সেই ভগবান বুদ্ধ, আর কোথায় আমার মত এই দীনহীন অকিঞ্চন! আমার আবেদন শুনিবার জন্য থামিলেন। আমি প্রভুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম—প্রভো! এই অধীনকে আপনার ভিক্ষু-দলে গ্রহণ করুন। তখন পরম কৃপালু ভগবান বুদ্ধ কহিলেন—হে ভিক্ষু, এস—আমার সঙ্গে চল। এই আমার একমাত্র দীক্ষা।" পরে সুনীত কহিতেছেন, "আমি অরণ্যে গিয়া ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত রহিলাম, এবং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে

লাগিলাম। তখন দেবতারাও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বুদ্ধদেব আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "সদাচার শুদ্ধাচার পুণ্যবলে হীনবর্ণও ব্রাহ্মণ হয়—ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত লক্ষণ তাহাই।" জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্মগুণেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধদেব মাতঙ্গের গল্পে বলিয়াছেন—"মাতঙ্গ চণ্ডাল নিজ কর্ম্মগুণে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জন্মিয়াই কেহ চণ্ডাল হয় না—জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না—নিজ কর্ম্মগুণেই ব্রাহ্মণ—নিজ কর্ম্মদোষেই চণ্ডাল।" (সূত্ত নিপাত)। "তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া অভ্যাস করেন—যিনি সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়, অজ্ঞান ও পাপ-কলঙ্ক হইতে বিনির্ম্মুক্ত।" (ধর্ম্মপদ)। কিন্তু ইহা হইতে মনে করিবেন না যে, বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা উন্মূলন করিয়া সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন। সমাজের মধ্যে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা, হীনবর্ণকে উন্নত করিবার চেষ্টা, অথবা সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার সংশোধন চেষ্টা, ইহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সমাজ সংস্কার তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গীভূত ছিল না। রাজ্য ও সমাজ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ভিক্ষু যিনি সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার সঙ্ঘ-নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই হইল। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্যান্য নিয়ম রক্ষায় ভিক্ষুরা হস্তক্ষেপ করিতেন না—তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক আচার ক্রিয়া